ভাষার কড়চা

রাগিব হাসান

ragibhasan@gmail.com http://www.ragibhasan.com

এক.

বাংলা ভাষা নিয়ে আমাদের নিজেদের আবেগ, অথবা অবজ্ঞা, কোনোটারই কমতি নেই। আসলে ছোটবেলা থেকে ভাষা বিষয়ে পড়া মানেই ভাব-সম্প্রসারণ, বা কবিতার তাৎপর্য লেখার মতো ভয়াবহ বিষয়ের জন্য মানুষ ভাষার প্রতি আগ্রহ হারায়।

অথচ ভাষা হলো আমাদের প্রাণের সবচেয়ে কাছের একটা জিনিষ।

যাহোক, ভাষা নিয়ে অনেক খুঁটিনাটি বিষয় পড়ছিলাম উইকিপিডিয়ার সুবাদে। আগেই জানতাম, কিন্তু তার পরেও অনেক গুলো ছোটখাট বিষয় হয়তো অনেকের কাছে ইন্টারেস্টিং লাগতে পারে - যেমন -

বাংলা, তথা সংস্কৃত হতে সৃষ্টি হওয়া সব ভাষাই ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষার সাথে জড়িত। আসলে একই মূল উৎস হতে এসব ভাষার উৎপত্তি। এই ব্যাপারটা অষ্টাদশ শতকে জার্মান ভাষাবিদেরা প্রথম লক্ষ্য করেন। যেমন, সংস্কৃত পিতা - পিত্র, ইউরোপীয় অনেক ভাষায় ফাদার, পিতার। এরকম আরো অনেক উদাহরণ দেখানো যায়। এই সব কিছু বিবেচনা করে এই মহাগোষ্ঠীর নাম দেয়া হয়েছে ইন্দো-ইয়ুরোপায়ন ভাষাগোষ্ঠী। পুরা ইউরোপের ইংরেজি, জার্মান, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, পর্তুগীজ, রাশিয়ান, ইতালিয়ান, দক্ষিণ এশিয়ার হিন্দি, উর্দু, বাংলা, মরাঠি, পাঞ্জাবী, - এই সব ভাষাই এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। দুনিয়ার প্রায় ১৬০+ কোটি মানুষের মাতৃভাষা এটা (আরো অনেক বেশি মানুষ এই ভাষাগুলোতে কথা বলতে পারেন)।

তবে, ইউরোপের সব মানুষ আবার এই ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাতে কথা বলেন না। যেমন, স্পেনের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী বাস্ক-রা বাস্ক ভাষাতে কথা বলে, যার সাথে আর কোনো ভাষার একেবারেই মিল নেই। সেরকম হাঙ্গেরিয়দের ভাষাও অন্য উৎস হতে আসা।

দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি বলা একক ভাষা হলো চীনের ম্যান্ডারিন ভাষা (এর নামটা এসেছে সংস্কৃত "মন্ত্রী" হতে, কারণ ভাষাটার চীনা নামটার অর্থ মন্ত্রীদের ভাষা, অর্থাৎ ভদ্রলোকের সাধু ভাষা)। তবে চীনেই বহু ভাষা চালু আছে, এক অঞ্চলের লোক অন্যদের ভাষা একেবারেই বোঝেনা।

বাংলাদেশের ভাষা বাংলা, তবে এর মধ্যে সিলেট ও চট্টগ্রামের ভাষাকে উপভাষার মর্যাদা দেন অনেকে ভাষাবিদ। চট্টগ্রামের ভাষা আর আরাকানের ভাষা প্রায় এক, লেখার রীতিটাই কেবল আলাদা। ত্রিপুরাতে বাংলা ব্যবহার হয়ে আসলেও ইদানিং ওরা বাংলার বদলে কোকবরক নামের একটা ভাষা চালু করার চেষ্টা করছে।

বাংলা হরফ শুধু বাংলা নয়, অসমীয়া এবং মণিপুরী ভাষাতেও ব্যবহার করা হয়।

শ্রীলংকায় পাওয়া ১০ম শতকের একটা মূদ্রায় পরিষ্কার বাংলা লেখা দেখেছি!! অবাক হয়েছিলাম, তবে শ্রীলংকার উপকথায় রয়েছে, বাংলারই এক রাজপুত্র লংকা জয় করেছিলেন।

দুই.

উইকিপিডিয়া নিয়ে কাজ করতে করতে একদিন একটা মূদ্রা দেখে চমকে গেলাম। মূদ্রাটি দশম শতকের, এবং শ্রীলংকার চোল রাজবংশের রাজা উত্তম চোলের শাসনামলে চালু করা মূদ্রা।

ছবিঃ শ্রীলংকার চোল রাজবংশের রাজা উত্তম চোলের শাসনামলে চালু করা মূদ্রা।
সূত্রঃ http://en.wikipedia.org/wiki/Uttama_Chola

তবে আমার চমকে যাওয়ার কারণটা অন্য। মূদ্রার গায়ে উত্তম চোলের নাম লেখা আছে, বাংলা হরফে!! শ্রীলংকায় কীভাবে গেলো এই বাংলা লেখা? উত্তম চোলের শাসনামল ৯৭০ হতে ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ অবধি। চোল রাজবংশ ছিলো দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলংকার অধিপতি, ১৩শ শতক পর্যন্ত এদের রাজ্যের বিস্তার ঘটেছিলো মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, সুমাত্রা ও বালি দ্বীপেও।

যাহোক, এদের মুদ্রায় বাংলা এলো কী করে?

এই প্রশ্ন রেখেছিলাম উইকিপিডিয়ান সামীরুদ্দৌলা খানের কাছে, যিনি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাট লস অ্যাঞ্জেলেসে ভাষাবিজ্ঞানে পিএইচডি করছেন। মুদ্রাটা দেখে আমার মতো উনিও চমকে গিয়েছিলেন প্রথমে। পরে বেশ খোঁজাখুজি করে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করালেন।

আসলে বাংলা হরফের উদ্ভব হয়েছে নাগরী লিপি হতে। নাগরী লিপির উদ্ভব হয় প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মী লিপি হতে। সংস্কৃত লেখা হতো ব্রাহ্মী লিপিতে। নাগরী লিপির এক শাখাতে রয়েছে বাংলা হরফ, যা অসমীয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া-মণিপুরী ভাষা লেখাতেও ব্যবহৃত হয়। এই শাখার নাম হলো পূর্ব-নাগরী লিপি।

আর অন্য শাখায় রয়েছে দেবনাগরী। আধুনিক সময়ে হিন্দি, মারাঠি, সংস্কৃত, নেপালী ইত্যাদি ভাষা লেখায় এই হরফ ব্যবহৃত হয়।

সামীরের ব্যাখ্যা হলো, ১০ম শতকের দিকে তৈরী করা এই মূদ্রাতে আসলে নাগরী লিপির এক আদি রূপ দেখতে পাচ্ছি। নাগরী লিপি তখনো পূর্বীয় আর দেবনাগরী - এতো বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে যায় নি। চর্যাপদের কথা মনে আছে? বাংলা ভাষার প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শন এই চর্যাপদ লেখা হয়েছিলো ৮ম হতে ১১শ শতকের মধ্যে। একই সময়ে চোল রাজবংশের ব্যবহার করা ভাষাতেও এই নাগরী হরফ ব্যবহার করা হয়েছিলো।

যাহোক, ব্যাখ্যাটা নাহয় পাওয়া গেলো, কিন্তু তার পরেও, আধুনিক বাংলা লিপির সাথে এই মুদ্রাটার এতো প্রচন্ড মিল যে, চমকে যেতে হয়।

প্রাচীন ভারতের অনেক লিপির পাঠোদ্ধার আজো হয়নি। এর মধ্যে রয়েছে হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর দূর্বোধ্য শিলালিপি। মিশরের হায়েরোগ্লিফিকের কথা মনে পড়তে পারে, উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ওটাও দুর্বোধ্য ছিলো। নেপোলিয়ন মিশর জয়ের জন্য যখন অভিযান পাঠান, তাঁর সেনাবাহিনীর সাথে কিছু ভাষাবিদও পাঠিয়েছিলেন। এদের একজন, ক্যাপ্টেন পিয়েরে ফ্রাঁসোয়া বুচার্দ মিশরের রশীদ নামের শহরে খুজে পান একটা শিলালিপি, যার নাম দেয়া হয় রোসেট্টা স্টোন (শহরের ফরাসী/ইংরেজি নাম রোসেট্টা হতে)। তার পাঠোদ্ধার করেন ভাষাবিদ জাঁ ফ্রাঁসোয়া শাঁপোলিও, ১৮২২ সালে।

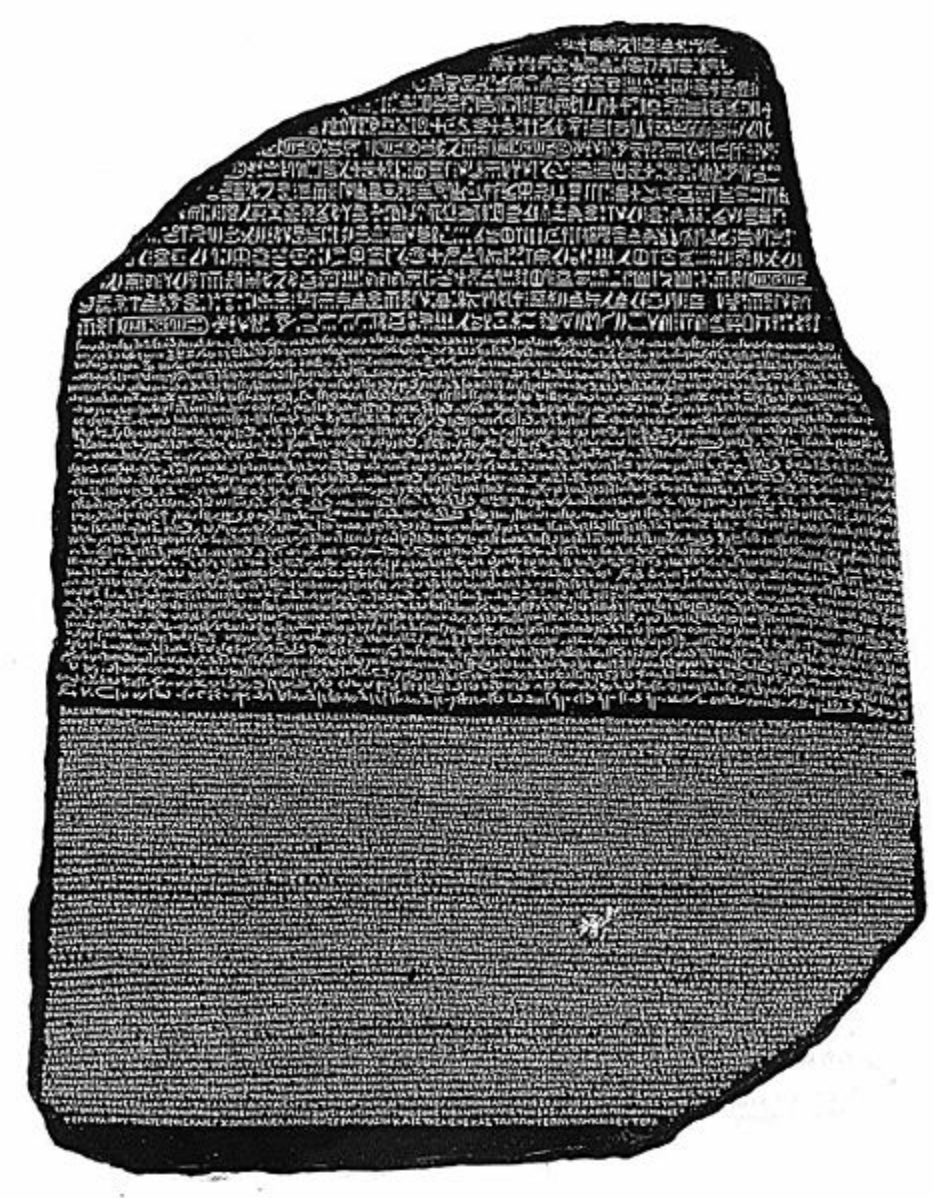

ছবিঃ রোসেট্টা স্টোন

সূত্রঃ http://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_Stone

পাঠোদ্ধার করলেন কীভাবে? আসলে ঐ শিলালিপিতে হায়েরোগ্লিফিকের (চিত্রলেখ) পাশাপাশি ডেমোটিক ও পুরানো গ্রীক ভাষাতেও একই কথা লেখা ছিলো। লেখা মিলিয়ে মিলিয়ে শাঁপোলিও হায়েরোগ্লিফিকের ছবিগুলোর অর্থ বোঝার পদ্ধতি বের করেন।

কিন্তু আজো হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর লেখাগুলোর পাঠোদ্ধারের জন্য ওরকম কিছু পাওয়া যায় নি। তাই ভারতের আদি ঐ সভ্যতার কথা, তাদের জীবনকাহিনী রয়ে গেছে অজানাই।

তিন.

ভাষার সৃষ্টি অনেক আগে হলেও ভাষা লেখার পদ্ধতি এসেছে পরে। লিখন পদ্ধতির উদ্ভব হয় প্রথমে সুমের অঞ্চলে (আধুনিক ইরাক)। এর পাশাপাশি মিশরেও লেখালেখি শুরু হয়, আজ থেকে প্রায় হাজার পাঁচেক বছর আগে। সুমেরের লেখাগুলো কাদার টুকরার মধ্যে কাঠি দিয়ে চাপ দিয়ে লেখা হতো। এগুলোকে বলা হয় কিউনিফর্ম লেখা।

মিশরের চিত্রলেখের নাম হায়েরোগ্লিফিক। এই ধরণের লেখায় ছবি বা চিহ্ন দিয়ে বিভিন্ন শব্দকে বোঝানো হতো। একেকটি চিহ্ন বা ছবি একেকটি শব্দ বা বাক্যের প্রতীক।

চীনের লেখাও এরকম চিত্রভিত্তিক। সেই আদিকাল থেকে শুরু হওয়া ঐ পদ্ধতিই এখনও চীনে চালু। চীনা ভাষায় প্রায় ৫০০০ বা তারো বেশি চিহ্ন চালু আছে। কোনো বর্ণমালা নেই। আমার পরিচিত চীনাদের প্রশ্ন করেছিলাম, ওদের পড়াশোনা শিখতে সময় লাগে কী রকম। ওদের কাছ থেকে জেনেছি, পত্র পত্রিকা পড়ার মতো বিদ্যা অর্জন করতে ওদের অন্তত ক্লাস সেভেন বা এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করতে হয়।

চিত্রভিত্তিক এই লিখন পদ্ধতির ঝামেলা অনেক। এর বিকল্প হিসাবে উদ্ভব হয় বর্ণমালা। আর এই বর্ণমালার স্রষ্টা হলো ফিনিশীয় এবং সেমিটীয় জাতির লোকেরা। (ইহুদীরা ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্য অনেকে এই সেমিটীয় জাতির বংশধর, আর ফিনিশীয়রা ছিল এখনকার লেবানন/সিরিয়া এলাকার বণিক সম্প্রদায়)। যাহোক, এসব লিপিতে ছবির বদলে বর্ণমালার মাধ্যমে শব্দ লেখা হতো। শেখা সহজ বলে চিত্রলেখের চাইতে বর্ণমালার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় সহজেই।

শুরুর দিকের মধ্যপ্রাচ্যের ঐ সব বর্ণমালার লেখাগুলো ডান থেকে বাম দিকে লেখা হতো। ঐ সব লিপির উত্তরসূরী হচ্ছে হিব্রু ও আরবি, যা আজও ডান থেকে বাম দিকে লেখা হয়। উলটা দিকে, অর্থাৎ বাম থেকে ডানে লেখার রীতি শুরু করে গ্রীকরা।

ভারতবর্ষ সহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে চালু অধিকাংশ লিপির পূর্ব পুরুষ হলো আরামিক লিপি। তা থেকে আসে ব্রাহ্মী লিপি, প্রায় হাজার দুয়েক বছর আগে। আর সেটা থেকেই ধীরে ধীরে উদ্ভব হয় বাংলার।

.....